দ্বিমুখী মেজাজ বৈকল্য
(বাইপোলার মুড ডিসওর্ডার)

আবিদ খুব শান্ত, ভদ্র প্রকৃতির ছেলে। বাবা-মায়ের তিন সন্তানের মধ্যে সে অতি আদরের। পড়াশুনায় ছোটবেলা থেকে ভীষণ মেধাবী। শিক্ষকরা সব সময়ই তাকে নিয়ে উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। সবাই তাকে মুখ গুঁজে টেবিলে বসে পড়াশুনা করতেই দেখে। কারো সাথে খুব একটা মিশতে পারে না। কথা বলে কম।

পড়াশুনার পাশাপাশি সে খুব ভালো আবৃত্তি করে। মাঝে মাঝে কবিতা লেখার চেষ্টা করে। বরাবরের মতো ক্লাস এইটে ট্যালেন্ট পুলে বৃত্তি পেয়েছে। ক্লাস নাইনে ওঠার পর নাওয়া খাওয়া ভুলে পড়তেই থাকে। তাকে যে কোন মূল্যে হোক সবার চেয়ে ভালো রেজাল্ট করতেই হবে। আবিদের পরিবারটি সমাজে একটি সম্মানিত অবস্থানে আছে। তার বাবা খ্যাতিমান ব্যবসায়ী। মা সমাজকর্মী। বাবা-মা ব্যস্ততার জন্য সন্তানদের খুব একটা সময় দিতে পারেন না।

তার মতে, তার বাবা অত্যন্ত ভালো মনের মানুষ, কিন্তু, একটু রাগী। তার পছন্দমতো কাজ হলে তিনি যেমন আদর করেন তেমনি কাজের ধরন পছন্দ না হলে প্রচণ্ড তিরস্কার করেন।

আবিদ এস.এস.সি. ও এইচ.এস.সি.-তে ভালো রেজাল্ট করে একটি স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো একটি বিষয়ে পড়ার সুযোগ পায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার পরপরই বন্ধু-বান্ধবরা তাকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া শুরু করে। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে ভালো রেজাল্টের পর সবাই তার সাথে মিশতে চায়। তাকে জোর করে পড়া থেকে উঠিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে নিয়ে যায়। সে কাউকে মুখের ওপর না করতে পারে না। এ সময় কণা নামের একটি মেয়েকে তার ভীষণ ভালো লাগতে শুরু করে। মেয়েটির কথা-বার্তা, চাল-চলন, জীবনদর্শন তাকে মুগ্ধ করে ফেলে। এভাবে বছরখানেক যেতে না যেতে বন্ধুরা বিষয়টি উপলব্ধি করে তার পক্ষ থেকে মেয়েটিকে ভালোবাসার প্রস্তাব দেয়। এ কথা শোনামাত্রই মেয়েটি রেগে যায়। সে আবিদসহ তার বন্ধুদের ডেকে ভীষণভাবে তিরস্কার করে। সাথে সাথে সে এটাও বলে যে সে অন্য এক ছেলেকে পছন্দ করে।

এ ঘটনার পরপরই সবাই আবিদকে মনমরা দেখতে পায়। কারো সাথে তেমন কথা বলে না, অল্পতেই ক্লান্তিবোধ করে, ক্লাসে পড়াশুনায় মনোযোগ কম। বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিয়মিত আসতে শুরু করে। বন্ধু-বান্ধবরা খোঁজ নিলে বলে, তার শরীর ভালো নয়। সে একাকী সময় কাটাতেই বেশি ভালো বোধ করে। এ ঘটনার পর থেকেই সে নিজেকে একজন অক্ষম মানুষ হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করে। সব সময়ই তার মন খারাপ লাগে, কাজের আগ্রহ ইদানিং হারিয়ে ফেলেছে। নিজেকে এ ঘটনার জন্য দোষী মনে হয়। সবাই তাকে নিয়ে কী ভাবছে - এ বিষয়টি তাকে চিন্তিত করে ফেলে। রাতে ঘুমায় না, বসে বসে কবিতা লেখে। কবিতা লেখার পর সেটা ছিঁড়ে ফেলে। কোন কিছুতেই শান্তি পায় না। এ সময়ে সে মিড টার্মের কয়েকটি পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকে। সব মিলিয়ে তৃতীয় বর্ষে তার রেজাল্ট খুব খারাপ হয়। শিক্ষক এবং তার বন্ধুরা এতে খুবই অবাক হয়। শিক্ষকরা তাকে ডেকে পাঠায়; সে বলে, তার শরীর ভালো নয়। কারো সাথে সে বিষয়টি শেয়ার করে না। বন্ধুরা তাকে ডাক্তার দেখাতে বলে, বন্ধুরা আঁচ করতে পারলেও, সে বিষয়টিকে অস্বীকার করে। তার রেজাল্ট ক্রমান্বয়ে খারাপ হতে থাকে। মিড-টার্ম পরীক্ষা না দেওয়া, উপস্থিত থেকে একটিমাত্র প্রশ্নের উত্তর লিখে খাতা জমা দিয়ে আসা - এভাবেই সে চলতে থাকে। শেষ বর্ষে তার রেজাল্ট আরো খারাপ হয়। এ বিষয়টি তাকে আরো মনমরা করে ফেলে।

দীর্ঘ দুবছর এ অবস্থা চলে। মাস্টার্সে ওঠার পর তার বন্ধুরা তাকে জোর করে একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যায়। কিন্তু, ডাক্তার ওষুধ দিলেও সে নিজে নিজে ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেয়। তার মনে হয়, সবাই তাকে পাগল ভাবছে। এর মধ্যে হঠাৎ করে একদিন সে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ক্লাসে গিয়ে টিচারের কথা থামিয়ে উচ্চস্বরে কথা বলতে থাকে, শিক্ষকদের সাথে যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হয়। শান্ত-শিষ্ট আবিদ হঠাৎ করে বদলে যেতে শুরু করে। উত্তেজিত হয়ে অনর্গল কথা বলে। পছন্দ না হলে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। নিজের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতে শুরু করে। রাতে ঘুমায় না। বাড়িতে গিয়ে সবাইকে বকা-ঝকা করে। তার পছন্দের বইপত্র বিক্রি করতে শুরু করে। নতুন নতুন কাজের পরিকল্পনা করে। এমতাবস্থায় তার বাবা-মা ও ছোট ভাই এদিকে নজর দেয়। তারা একজন সাইকিয়াট্রিস্টের সাথে কথা বলে।

উপরোক্ত কেসটিতে আবিদের যে সমস্যাটি পরিলক্ষিত হয়েছে তাকে বলে দ্বিমুখী মেজাজ বৈকল্য (বাইপোলার মুড ডিসওর্ডার)। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির মধ্যে বিষণ্নতা ও হর্ষোন্মত্ততা (ম্যানিয়া) পালাক্রমে উপস্থিত হয়। ম্যানিয়া পর্যায়ে ব্যক্তির মধ্যে যে লক্ষণগুলো উপস্থিত থাকে (এক সপ্তাহ ধরে এ লক্ষণগুলো পরিলক্ষিত হবে) তা হলো:

- অনর্গল কথা বলা, উত্তেজিত বা খিটখিটে হয়ে যাওয়া
- চিন্তা দ্রুতগতিতে বদলে যাওয়া, অর্থাৎ ঘন ঘন প্রসঙ্গ পাল্টানো ও বড় বড় পরিকল্পনা করা
- কাজের তৎপরতা বেড়ে যাওয়া
- খুব সহজেই বিরক্ত হওয়া
- ঘুমের পরিমাণ কমে যাওয়া
- আত্মমর্যাদার অনুভূতি বৃদ্ধি পাওয়া। অর্থাৎ, নিজের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করা (যেমন তার অসাধারণ প্রতিভা রয়েছে)
- কোন বিষয়েই মনোযোগ দিতে না পারা
- আনন্দ খুব বেড়ে যাওয়া

বিষণ্নতার সময়ে যে লক্ষণগুলো পরিলক্ষিত হয় (কমপক্ষে দুসপ্তাহ ধরে এ লক্ষণগুলো চলতে থাকবে):

- প্রায় প্রতিদিন অথবা দিনের বেশিরভাগ সময় মনমরা থাকা
- কাজের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলা
- ঘুম কমে যায়, কারো ক্ষেত্রে বেড়েও যেতে পারে
- ক্লান্তি লাগে, সহজেই অবসন্ন বোধ করে
- নিজের সম্পর্কে নেতিবাচক চিন্তা করা; নিজেকে দোষী মনে হয়, অনেকেই নিজেকে অপদার্থ মনে করতে শুরু করে
- কাজে মনোযোগ দিতে পারে না
- খুব সহজেই ভুলে যায় ও সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে শুরু করে
- কারো কারো মধ্যে আত্মহত্যার চিন্তা চলে আসে

প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে, বিশেষতঃ ২০ বছরের উপরে এবং ত্রিশ বছরের মধ্যে, এ রোগটি সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। ১-১.৫% প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে এ রোগটি দেখা যায়।

বিষণ্নতা ও ম্যানিয়া চক্রাকারে আবর্তিত হয়। ঔষধ ব্যবহার করে এ রোগটি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। অনেকের ধারণা, কিছু দিন চিকিৎসা করে, বিশেষতঃ ওষুধের চিকিৎসা, বন্ধ করে দিলেই ভালো। কিন্তু, এ ধরনের সমস্যায় দীর্ঘ মেয়াদি চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। ওষুধ বন্ধ করলেই লক্ষণগুলো ফিরে আসে। পাশাপাশি মনোচিকিৎসা বা সাইকোথেরাপি গ্রহণ করলে এ ধরনের ব্যক্তি সুস্থতার সাথে তার জীবনে কর্মক্ষম হয়ে উঠতে পারে।

মনোচিকিৎসার জন্য একজন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টের সহযোগিতা নিতে পারেন। তিনি দ্বিমুখী মেজাজ বৈকল্যে ভোগা ব্যক্তিকে যেভাবে সাহায্য করে থাকেন:

১. ব্যক্তির বিষণ্নতায় আক্রান্ত হওয়ার অন্যতম কারণ তার ভুল/ত্রুটিপূর্ণ চিন্তাধারা। এর ফলে তার মধ্যে গভীর দুঃখবোধ জন্মায় ও আত্মমর্যাদা বিধ্বস্ত হয়ে যায়। কগনেটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি নামক চিকিৎসাপদ্ধতির মাধ্যমে একজন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট তার এ ধরনের অনুপযোগী চিন্তাধারা পরিবর্তনের চেষ্টা করতে পারেন।

বিষণ্নতা ও ম্যানিয়া চক্রাকারে আবর্তিত হয়। ঔষধ ব্যবহার করে এ রোগটি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। অনেকের ধারণা, কিছু দিন চিকিৎসা করে, বিশেষতঃ ওষুধের চিকিৎসা, বন্ধ করে দিলেই ভালো। কিন্তু, এ ধরনের সমস্যায় দীর্ঘ মেয়াদি চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। ওষুধ বন্ধ করলেই লক্ষণগুলো ফিরে আসে। পাশাপাশি মনোচিকিৎসা বা সাইকোথেরাপি গ্রহণ করলে এ ধরনের ব্যক্তি সুস্থতার সাথে তার জীবনে কর্মক্ষম হয়ে উঠতে পারে।

---

২. চাপের মুখোমুখি হলেই এ ধরনের ব্যক্তির সমস্যাগুলো ফিরে আসতে পারে। সাইকোথেরাপিতে তাকে শেখানো হয়, কীভাবে চাপ মোকাবিলা করে সে টিকে থাকতে পারে। অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টিকারী পরিস্থিতি যেহেতু তার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ তাই তাকে কতটুকু মাত্রা পর্যন্ত সে ঝুঁকি নিবে সে বিষয়টি অবহিত করানো হয়।

৩. তাকে শেখানো হয় কোন কোন লক্ষণ দেখলে সে বুঝতে পারবে তার সমস্যাগুলো ফিরে আসছে। যেমন, হঠাৎ ঘুম কমে যাওয়া বা অতিরিক্ত চিন্তা আসা।

৪. দ্বিমুখী মেজাজ বৈকল্যে আক্রান্ত ব্যক্তিদের প্রায়ই একটি আচরণ করতে দেখা যায় - অসুস্থতার সময় তার জীবনে যেসব ক্ষতি হয়েছে সে সুস্থ অবস্থায় অতি অল্প সময়ে সেই ক্ষতিগুলো পূরণ করতে চায়। এটা তার জন্য ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে বাস্তবসম্মত লক্ষ্য নির্ধারণ করে ধাপে ধাপে কাজ করতে উৎসাহিত করা হয়।

৫. সাইকোথেরাপিতে পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটানোর মাধ্যমে একটি সাপোর্টিভ পরিবেশ তৈরি করা হয়। পরিবারের সদস্যদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সাপোর্টিভ পরিবেশ তৈরি, ঝুঁকি কমানো, অতিরিক্ত চাপ না নেওয়া, ওষুধের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়।

ব্যক্তির চিন্তাধারা পরিবর্তন, বাস্তবসম্মত লক্ষ্য নির্ধারণ, চাপ মোকাবিলা করা, মেজাজ পরিবর্তন ধরতে পারা, সাপোর্টিভ পরিবেশ তৈরি ইত্যাদির মাধ্যমে একজন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট তাকে সুস্থ ও কর্মক্ষম জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন।

জোবেদা খাতুন
প্রভাষক, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়